প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশিত ছাত্র রাজনীতিতে শোভন-রাব্বানীদের ঠাঁই নেই

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০২

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লালিত স্বপ্নে কুঠারাঘাত করার কারণে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রের সূত্রে জানা যায়, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তারা পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছে। অর্থাৎ ছাত্রলীগের ওই দুই নেতার বিরুদ্ধে চলতি মাসজুড়ে চলা নানা আপত্তিকর সংবাদ ও তর্ক-বিতর্ক পরিণতিতে পৌঁছেছে। এ কথা স্পষ্ট, শেখ হাসিনার প্রত্যাশার প্রতি ছাত্রলীগের ওই নেতারা মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু ভবিষ্যৎ জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করেছে।

advertisement

লেখাবাহুল্য, আমাদের সবার মনে আছে, ১৩ মে (২০১৯) ছাত্রলীগের ৩০১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষিত হওয়ার পর পদবঞ্চিতদের বিক্ষোভে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ছাত্রলীগের ৩০১ সদস্যের ওই কমিটিতে অছাত্র, ছাত্রদলের কর্মী, বিবাহিত ও বিতর্কিতদের স্থান দেওয়া হয়, এমন অভিযোগ করে বিক্ষোভ মিছিল ও সংবাদ সম্মেলন করে পদবঞ্চিত ও কাক্সিক্ষত পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা। পদবঞ্চিত নেতা-কর্মী-সমর্থকরা নিজের ক্যাম্পাসে হামলার শিকারও হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১১ মে ছাত্রলীগের ২৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের পর কমিটি ঘোষণার নিয়ম থাকলেও শীর্ষ পদের নেতৃত্ব বাছাইয়ে সময় নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। সম্মেলনের আড়াই মাস পর ৩১ জুলাই সংগঠনটির শীর্ষ দুই নেতা অর্থাৎ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়। চলতি বছরের এপ্রিলে দ্রুত ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে কেন্দ্রীয় নেতাদের তাগিদ দিয়েছিলেন ষাটের দশকের ছাত্রলীগ নেতা শেখ হাসিনা। পহেলা বৈশাখের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজন বানচালের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'তা হলে কী হলো? ছাত্রলীগ তো আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে।' সেদিন এক কেন্দ্রীয় নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ঘটনায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং ছাত্রলীগের সাবেক কিছু নেতার ইন্ধন আছে জানালে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়ে গেলে এসব খেলাধুলা বন্ধ হয়ে যেত।' তার প্রত্যাশা ছিল, দলীয় নেতারা সক্রিয় হলে দল আরও গতিশীল হবে; ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকবে না। কেবল ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনের পর একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মারামারি-হানাহানির ফলে বেশ কিছু কমিটি স্থগিত এবং বাতিল ঘোষণা করা হয়। ২০১৭ সালের ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের ৬৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনীতে ছাত্রলীগের প্রত্যেক নেতাকর্মীকে উদ্দেশ করে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'মনে রাখতে হবে, ছাত্র রাজনীতি আমরা করব। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করাটাই হচ্ছে সব থেকে বড় এবং সবার আগের কাজ।' তিনি ছাত্র রাজনীতির আদর্শের কথা সব সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য কমিটি ঘোষণার পর ছাত্রলীগের হানাহানি তার কাছে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল। এখন যেমন ছাত্রলীগের চাঁদাবাজির ঘটনা তার কাছে অগ্রহণযোগ্য।

২৮ বছর পর চলতি বছরের ১১ মার্চ 'ডাকসু' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখন থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে নতুন নেতৃত্ব ও ভবিষ্যৎ ছাত্র রাজনীতির গতি-প্রকৃতি। শেখ হাসিনা তার একটি প্রবন্ধে ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে লিখেছেনÑ 'ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানে নিজেকে গড়ে তোলা।' (শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র ১, পৃ. ১৭৯) এ জন্য তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার উপযুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন ১৯৯৪ সালে। তিনি আরও লিখেছেনÑ 'আমরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরোধী।' বর্তমান শতাব্দীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ নির্মাণের নতুন প্রজন্মের সাহসী সৈনিকরা অনেকেই নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন। আর জননেত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী নেতৃত্বের কারণে দেশ এগিয়ে চলেছে। পূর্বে উল্লেখিত, 'আগে শিক্ষা, পরে রাজনীতি'র মতো ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বর কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসে জড়িতদের বিরুদ্ধে 'যথাযথ ব্যবস্থা' নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সেদিন শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'এখানে একটা নির্দেশ আমি দিতে চাই, যারাই এ ধরনের

সমস্যা সৃষ্টি করবে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস করবে, যে দলের হোক, কে কোন দলের সেটা দেখার কথা না, যারা এ ধরনের কর্মকা- করবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে।' অবশ্য তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বলা হয়েছিলÑ 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের দায় ছাত্রলীগের নয়।' তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জানি যে, যারাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ-গোল করুক, একটা পর্যায়ে দেখা গেছে সেখানে ছাত্রের চেয়ে অছাত্র বেশি, কিছু বহিরাগত, তারাও এর সঙ্গে জড়িত থাকে।' তার মতে, দোষীদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তি দিলে তাৎক্ষণিকভাবে এসব ঘটনা 'নিয়ন্ত্রণ' করা যায়। কয়েক বছর আগে চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশের কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের কাছে প্রত্যাশা করেন অনেক। ২০০৮ সালের নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের কথা তার মনে ছিল, এ জন্য ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে তিনি 'এগিয়ে যাচ্ছে দেশ' ইশতেহারটিও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা তরুণদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনেও তার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুবসমাজ। তার প্রত্যাশিত ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয়, বাস্তব। দেশকে এগিয়ে নিতে চান তিনি, বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকুক, সুখে থাকুক, উন্নত জীবন পাকÑ এটাই তার প্রত্যাশা। এ জন্য ছাত্র সংগঠন রাজনীতির নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করলে কিংবা চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের অনেক অন্তরায়ের মধ্যে একটি অন্তরায় হলো নোংরা ছাত্র রাজনীতি। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব ছাত্রদের ন্যায্য দাবিদাওয়াসহ জাতীয় ইস্যুতে সোচ্চার হওয়ার চেয়ে নিজেদের আখের গোছাতেই তারা ব্যস্ত। এ প্রবণতা থেকে ছাত্রদের মুক্ত করতে পারে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের একজন নেত্রী হিসেবে পাকিস্তান আমলে 'ইডেন মহাবিদ্যালয় ছাত্রী সংসদ' নির্বাচনে ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে হিসেবে নন, সে সময় মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সাধারণ ছাত্রীদের মন জয় করে নির্বাচিত হন। এটি ছিল আদর্শের জয়। এই আদর্শভিত্তিক সংগঠন ছাত্রদের পথপ্রদর্শক হতে পারে।

অবশ্য দুই দশক আগে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রদের দিয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার চিন্তা করেছেন। ১৯৯৪ সালে তার লিখিত 'শিক্ষিত জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। দেশের উৎপাদনমুখী কর্মকা-ের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করাই তার লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেক ছাত্র যাতে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক মেধা-মনন, ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সে সময় তার প্রত্যয়দৃপ্ত উচ্চারণ ছিলÑ 'শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমরা বদ্ধপরিকর।' আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বিরাজ করলে তা প্রতিবিধানে তিনি সব সময়ই উদ্যমী ভূমিকা পালন করেছেন। ওই প্রবন্ধে তিনি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দিয়ে নিরক্ষরতা দূর করার কথা বলেছিলেন। ছাত্রদের কাজে লাগানোর তার সেই স্বপ্ন রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ভিন্ন আঙ্গিকে সম্পন্ন হচ্ছে। উপরন্তু তিনি ফেল করা হতাশ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভেবেছিলেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দেশের সম্পদ উৎপাদনে ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করার কথা লিখেছেন। সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাদের সমাজের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল তার লেখায়। দুই দশক আগের এসব ভাবনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বর্তমান আমলের রাষ্ট্র পরিচালনায়। কিন্তু ছাত্র রাজনীতি অবশ্যই কলুষমুক্ত করতে হবে। গত মহাজোট সরকারের অন্যতম কীর্তি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন। 'শিক্ষানীতি-২০১০'-এ ছাত্রদের চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' তিন অংশে বলা হয়েছে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তাচেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলি (যেমনÑ ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো' হবে।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে ছাত্র রাজনীতির রূপ পাল্টেছে। ২০১৯ সালের ছাত্র রাজনীতি এবং ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতি কখনই এক নয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের পর ছাত্র রাজনীতি এবং বর্তমানের রাজনৈতিক বাস্তবতার রাজনীতি একেবারেই ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা এবং বর্তমানের ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে একটা স্পৃহা কাজ করত, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আলাদা একটা ভূখ- হবে এবং বাংলাদেশ তার আত্মপরিচয় হিসেবে জাতীয় সংগীত ও পতাকা পাবে। সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। ১৯৭১ সালে ছাত্ররা যুদ্ধ করেছে দেশের বাইরের শক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র সংগঠনগুলো দেশের ভেতরে অর্থাৎ ঘরের ভেতরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ভেতর এমন কতকগুলো সংগঠন রয়েছে, যারা বাঙালি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে না এবং যারা ধারণ করে তাদের দমন করার চেষ্টা করে। অথচ বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের চিন্তাচেতনা হলোÑ কীভাবে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করা। আওয়ামী লীগ সরকারের চিন্তাচেতনা ও কর্মসূচির সঙ্গে ছাত্রলীগের চিন্তাচেতনার একটা গভীর মিল রয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিকে সমর্থন করেÑ এর সফলতার জন্য কাজ করার কথা। আবার ছাত্রলীগ শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করে। এদিক থেকে ছাত্রলীগের প্রধান মন্ত্র হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে অবস্থান করে নিজেদের আখের গোছানোর

জন্য চাঁদাবাজি করাÑ ‘শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি’র অবমাননা। বরং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রেখে, আদর্শের রাজনীতি করার প্রত্যয়ে পরিচালিত হতে হবে ছাত্রলীগকেÑ এটাই সবার প্রত্যাশা।

ড. মিল্টন বিশ্বাস : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ এবং পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়